জোড়াতালির সংসার

এনামুল হক ইবনে ইউসুফ

রাইয়ান প্রকাশন

এই বইটি
উৎসর্গ করা হলো—

সংসারের সেই নিঃশব্দ কারিগরদের,
যারা নিজেদের স্বপ্ন ভেঙে
পরিবারের স্বপ্ন গড়ে তোলে।

শুরুর আগে

স্মৃতি অনেকটা সেলাই মেশিনের মতো—পুরোনো কাপড় জোড়া দেয়, ছেঁড়া জায়গায় নকশা আঁকে, আবার কোথাও কোথাও সুতোর টানে একটু কুঁচকেও যায়। ‘জোড়াতালির সংসার’ এমনই এক জীবনের পরতে-পরতে তুলে ধরা সেলাইয়ের গল্প, যেখানে হৃদয়ের ছেঁড়া অংশগুলো অনুভবের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই করে।

সংসার বলতে কেউ বোঝে একটা ঘর, দুটো মানুষ, চায়ের কাপে ঝনঝনানি। কেউ হয়তো বোঝে রুটি-রুজির হিসাব। কিংবা কারও কারও কাছে সংসার শুধুই নিঃসঙ্গতা। এই উপন্যাসে আমি এর যেকোনো একটাকে কেন্দ্র করে এগোইনি; বরং সেইসব চোখ-এড়িয়ে-যাওয়া ছোট ছোট মুহূর্তগুলো ধরার চেষ্টা করেছি, যেগুলো এক সময় জীবনের সবচেয়ে ভারী স্মৃতি হয়ে ওঠে।

‘জোড়াতালির সংসার’ আসলে কোনো নিটোল প্লটের গল্প নয়। এখানে আমি একটা মনে-রাখা গ্রাম, কিছু ব্যথায় ভরা মানুষ আর একটানা বয়ে চলা সময়কে কল্পনার সেলাই দিয়ে ধরতে চেয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ে আছে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া; আছে ছোটবেলা, আছে দুঃখ, আবার আছে আশা। এমন এক সংসার, যেখানে কেউ নিখুঁত নয়, কিন্তু সবাই ভাঙা অংশ নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে গড়ে তোলে ভালোবাসার দেয়াল।

এই গল্পের প্রতিটি চরিত্র যেন একেকটি সময়ের পিলার। যার গায়ে নিজস্ব গল্প লেখা থাকে। বাবা এখানে কঠোর বটগাছ, যার ছায়া অনেক সময় ঝড় ঠ্যাকায়, আবার রোদও আড়াল করতে পারে। মা হলেন একখানা সুঁই, স্নেহের সুতোর ভাঁজে যিনি প্রতিদিন জুড়ে রাখেন সংসারের ছেঁড়া প্রান্তগুলো। দাদি—সে তো সময়ের এক বালুকাঘড়ি, ধীরে ধীরে ঝরে পড়েন, কিন্তু যার ভেতরে আটকে থাকে অতীতের গুপ্তধন। ভাই-বোনেরা যেন সন্ধ্যার মেঘ, কখনো মন খারাপে বুনে ফেলে নিঃশব্দ অশ্রু, আবার হাওয়ার ছোঁয়ায় একসঙ্গে নেচে ওঠে আকাশের মুক্ত আঙিনায়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সংসারের বড় ছেলে—শিশির। সে যেন একটি বাতিঘর, নিজের চারপাশে আলোর রেখা ছড়াতে ছড়াতে ধীরে ধীরে নিজেই নিভে যায়। সে হাসে, কিন্তু নিজের জন্য নয়; সে বাঁচে, কিন্তু অন্যদের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার দায়ে। তার হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকা থাকে বিসর্জনের জলছাপ, যেটি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়।

এই উপন্যাসে নেই প্রাসাদের চাকচিক্য, নেই প্রেমের রোমাঞ্চকর তোলপাড়, নেই রূপকথার মতো অবাস্তব মোড়। আছে কেবল নিখাদ জীবন, যেটা প্রতিদিন আমরা দেখি কিন্তু খুব কমই গভীরভাবে উপলব্ধি করি। এই বই সেই জীবনেরই এক

খণ্ডচিত্র—যেখানে একটি টিনের ছাউনির নিচে প্রতিনিয়ত ঘটে যায় শত শত দৃশ্যপট, নিঃশব্দ নাটক, অদৃশ্য আবেগের বিস্ফোরণ।

'জোড়াতালির সংসার'—একখানা সময়চর্চিত আয়না, যার কুয়াশাভেজা কাচে ভেসে ওঠে চেনামুখ আর হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তের ছায়া। সেখানে দেখা যায় দাদির কণ্ঠে বুনে যাওয়া রূপকথার ঝালর, যা ঘুমপাড়ানি সুর হয়ে ওড়ে শিশিরভেজা রাতজুড়ে। শোনা যায় উঠোনজোড়া হইহুল্লোড়—ভাই-বোনেরা যেন নিঃশব্দ রংতুলিতে এঁকে চলেছে ছোটবেলার এক ছবির বই। পাকা আম গাছের নিচে পড়ে থাকা স্বর্ণছোপ ফল যেন হারিয়ে যাওয়া শৈশবের টোকেন আর স্কুল ফাঁকি দেওয়া দিনগুলো—তা ছিল যেন নিষিদ্ধ খুশির চোরাগলি, যেখানে ঢুকে পড়ে জীবনের সহজিয়া হাসি।

আর সেসব মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে... অতীতের কুয়াশায় আজও দাঁড়িয়ে থাকে এক ছায়ামূর্তি—ছোট চাচা শাহনেওয়াজ সিকান্দার—একদিন হঠাৎ করেই তিনি ফেরার হয়ে যান। আর সেই রাতটা—যেদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন—তা ছিল এই পরিবারের ইতিহাসের সবচেয়ে ভারী নীরবতা। কে জানে, কী এমন গভীর সত্য লুকিয়ে ছিল এর পেছনে। কোন সেই অপরাধ, যা শুধু একজনকে নয়, গোটা একটা পরিবারকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে রেখেছিল সমাজের কাছে। আমরা কি তা জানি?

এই উপন্যাসে আপনি কেবল গল্প পাবেন না—পাবেন এক দর্পণ, যেখানে রূপ নয়, প্রতিবিম্ব দেখা যায় আত্মার। এ আয়নায় আপনি দেখবেন অতীতের থমকে থাকা সময়ের নীরব হাহাকার। হয়তো আপনি নিজেই শিশির—এক নিঃশব্দ বৃক্ষ, যার শাখায় পাতার বদলে দায়িত্ব জন্মায়। যার হেসে ওঠা ছিল পরিবারের উৎসব, আর নীরবতা ছিল নিজের স্বপ্নের অন্ত্যেষ্টি।

এ উপন্যাস একটি ভাষাহীন গল্পের তরজমা, একটি ভাঙা ঘড়ির ভেতর থমকে যাওয়া সময়ে দীর্ঘশ্বাস, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অনুচ্চারিত কান্না। এটি আপনার জন্য, আপনার পরিবারের জন্য, সেই প্রশ্নগুলোর জন্য—যেগুলোর উত্তর কেউ কোনো দিন দেয়নি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক?

এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
৫ই আগস্ট ২০২৫
পল্লবী, মিরপুর-১২

এইসব রাত্রি শুধু এক মনে কথা কহিবার
নিজেদের সাথে,
পুরানো যাত্রীর দল যারা আজি ধূলির অতিথি
দাঁড়ালো পশ্চাতে।

দিনের ক্লান্ত চাহনিতে আঁধারের মদিরা লেগেছে। রাতের গায়ে কুয়াশার মিহি চাদর বিছিয়ে তপ্ত দিবাকর প্রশান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন। অসীম আকাশের জলসাঘরে নির্জনতার একপাক্ষিক অনুশাসন। পায়ে পায়ে শিশির ভাঙার তালে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার ভেদ করে গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি। দু-পাশের ছায়াঘেরা বনস্পতি, ঝোপঝাড় আর বুনো লতাপাতার আড়ালে ঝিঁঝি পোকার বিরামহীন কর্মযজ্ঞে কোলাব্যাং মাঝেমধ্যেই ভাগ বসাতে চাচ্ছে। থেকে থেকে কানে তালা লাগার জোগাড়। হঠাৎ হঠাৎ দূরে কোনো এক জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের মর্মভেদী, কর্কশ হুংকার। যেন ওরা বোঝাতে চাচ্ছে, রাত্রির এই নিস্তব্ধতা লৌকিক জগতের বাসিন্দাদের জন্য পথ চলার উপযুক্ত সময় নয়। সব মিলিয়ে রাতের ক্যানভাসে আঁকা এ এক গ্রামীণ জনপদের কার্তিক মাসের শীতের রাত। আর আমি? আমি শিশির। রাতের আকাশ চুইয়ে নয়, আমার জন্ম মাতৃগর্ভের কোমল অন্ধকারে। বাস্তবতার জমিনে পা পড়েছে আজ প্রায় সাতাশ বছর।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমার জন্ম হয়নি। আমি জন্মেছি সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে। লোকলজ্জার ভয়ে গরিব বলি না, তাই আমরা মধ্যবিত্ত। আব্বা প্রাক্তন পোস্টমাস্টার। দীর্ঘ প্রায় সাঁইত্রিশ বছর মানুষের সুখ-দুঃখের স্মৃতি বয়ে বেড়িয়েছেন। সই-সাবুদ, তদারকির পর নিয়মমাফিক ডাকপিয়নের হাতে তুলে দিয়েছেন টুকরো টুকরো করে জমিয়ে রাখা প্রিয়জনদের হাজারো শব্দের বুলি। ক্লান্তিহীন দায়িত্ববোধ যার শিরায় শিরায় মিশে ছিল, আজ সেখানে বার্ধক্যের অবসর নেমেছে। দেশে ইন্টারনেট এসেছে, মোবাইল ফোন এসেছে; তাতে আবার ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ এসেছে—আর আব্বাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন বাপু তোমাদের ম্যাও তোমরাই সামলাও। যেদিন আব্বা ডাক বিভাগ থেকে অব্যাহতি নিলেন, সেদিন থেকেই একটা শতাব্দীরও যেন পরিসমাপ্তি ঘটলো।

অবসরের পর থেকে প্রয়োজন ছাড়া আব্বা খুব একটা বাড়ি থেকে বের হন না। মাঝেমধ্যে ওয়াক্তের নামাজও ঘরেই আদায় করে নেন। তাই বলে যে সারা দিন ঘরে শুয়ে-বসে থেকে তার সময় কাটে, তা কিন্তু নয়। আগেকার দিনের মানুষরা সবাই-ই কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। অলসতা বলতে তাদের ডিকশনারিতে কোনো

শব্দই ছিল না। আমার আব্বাও সে-রকমই একজন পরিশ্রমী মানুষ। তবে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক এবং ভাবুক প্রকৃতির। জ্ঞানীরা একটু চাপা স্বভাবেরই হয় কিনা!

আমার আব্বা যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, তার প্রথম আলামত—তিনি প্রচুর বই পড়েন। সাংসারিক কাজের বাইরে দিনের বেশিরভাগ সময়ই তার বইয়ের সঙ্গে কাটে। কখনো সখনো ভোররাত অবধি চলে এই কর্মযজ্ঞ। যদিও গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিং-এর সমস্যাটা এখন অনেকাংশেই ঘুচেছে, তবুও লোডশেডিং যে একেবারেই হয় না, তাও বলা চলে না। চলতি বছর গ্রীষ্মকালে গোটা দেশজুড়েই তো বিদ্যুৎ সংকট ছিল। কি শহর আর কি গ্রাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলেকট্রিসিটি নেই। শহরে যাও ধরাবাঁধা একটা নিয়ম-কানুন ছিল; কিন্তু বাংলাদেশ রুলার ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কর্মকর্তারা যেন সেসবেরও উর্ধ্বে ছিলেন। মনমতো নিতেন ঠিকই কিন্তু দেবার বেলায় এত কৃপণতা দেখাতেন, যেন বিদ্যুৎ তাদের বাপ-দাদার সম্পত্তি!

এদিকে প্রচণ্ড গরমে সিদ্ধ হবার জোগাড়। প্রকৃতি থমথমে। কোত্থাও একটুখানি বাতাস নেই। ঘরের মধ্যে চুপচাপ কোথাও গিয়ে একটু বসলে কিংবা দাঁড়ালেও দরদর করে ঘাম ছুটছে; অথচ এমন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতেও আব্বাকে দেখতাম উদোম গায়ে গামছা চাপিয়ে এক হাতে টর্চের আলো ফেলে অন্য হাতে বই-এর পাতা উল্টাচ্ছেন।

ছেলে-মেয়েরা সাধারণত জিনগতভাবে বাবা কিংবা মা যেকোনো একজনের অথবা দুজনের থেকেই তাদের কিছু-না-কিছু গুণাগুণ লাভ করে থাকে। অবশ্য সব সময় সবটা গুণ হয় না, কিছু দোষও বংশপরম্পরায় এক শরীর থেকে আর এক শরীর, এক সত্তা থেকে আর এক সত্তায় প্রবাহিত হয়। এজন্যেই হয়তো কথায় বলে, 'বাপকা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।'

আমার আব্বাও তার বই পড়ার এই অসম্ভব রকমের বাতিকটা লাভ করেছিলেন তার বাবা অর্থাৎ আমার দাদাজানের কাছ থেকে। আমার দাদাজান জনাব শফিউদ্দীন তালুকদার যে কত বড় মাপের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তা তার সংগ্রহশালার দুর্লভ সব বইপত্র দেখলেই আন্দাজ করা যায়। দাদাজান শুধু বাংলা, ইংরেজিতেই নয়, আরবি, ফারসি এমনকি উর্দু ভাষাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। একসাথে এতগুলো ভাষায় দখল থাকার ফলে তার জ্ঞান অর্জনের পরিধিও ছিল বিস্তর। সেই সাথে উপাদানও। আব্বার মুখে শুনেছি, দাদাজান ডাকের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বইপত্র আনাতেন। তা ছাড়া তৎকালীন সময়ের বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের সম্পাদিত, পরিচালিত মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক পত্রিকাও আসতো নিয়মিত। দাদার বরাতে আমার আব্বাই এখন সেই সুবিশাল জ্ঞানভান্ডারের একমাত্র অভিভাবক।

দাদা শফিউদ্দীন তালুকদার তার কর্মজীবনে পেশায় ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল তার। দাদুর মুখে শুনেছি, গোটা স্কুল তার ভয়ে থরথর করে কাঁপতো। তথাপি তিনি ছিলেন বিনয়ের অবতার। মানুষের সাথে তার ছিল গলায় গলায় ভাব। মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি হতেন সমব্যথী। এলাকার সবাই তাকে শ্রদ্ধাভরে মাস্টার মশায় বলে ডাকতেন। আর তখন থেকেই ধীরে ধীরে আমাদের বাড়িটাও মাস্টারবাড়ি নামে সুপরিচিত হতে থাকলো। এখন কেউ আর আমাদের বাড়িটাকে তালুকদার বাড়ি বলে সম্বোধন করে না; বরঞ্চ মাস্টারবাড়ি বললেই একনামে চেনে।

তালুকদার বাড়ির তালুকের জৌলুশ যদিও এখন আর আগের মতো নেই। একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পূর্বপুরুষদের অর্জিত সম্ভ্রমটুকুর জোরে লোকজন যাও এক-আধটু সম্মান করত আমাদের, ওই এক ছোট চাচা-কাহিনিতে তাও এখন প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। সমস্যা হলো আজকাল পয়সাকড়ি ছাড়া মানুষের এমনিতেও খুব একটা কদর নেই। লোক চোর কি বাটপার তাতে কিছু আসে যায় না। টাকা আছে, তো তোমার দাম আছে। টাকা নেই, তোমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না—আছো কি নেই!

আব্বার মুখে শুনেছি, এককালে গ্রামের লোকজন নাকি মুখে মুখে জায়গা-জমি বেচাকেনা করতেন। দলিল, দস্তাবেজ ছাড়াই শুধু মুখের কথায় বছরের পর বছর জমির নতুন মালিক সেসব জমি ভোগ করতেন। এখনকার যুগে সেসব মানুষ আর কোথায়? বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা—এখন কি আর আছে আমাদের রক্তে? মাটির সোঁদা গন্ধ, সন্ধেবেলা হারিকেনের আলোর নিচে আমপাতা জোড়া জোড়া, কাজলা দিদির অভিমান, পাঁচের নামতা কিংবা রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে নানু-দাদুর মুখে রূপকথার গল্পে শোনা সেই রাজপুত্ররা—কোথায় গেল সব? আধুনিকতা! আধুনিকতার বেড়াজালে আমরা এখন বন্দি। গ্রাম, গ্রাম্য পরিবেশ বললে, মনের ভেতর সুখের যে ছবিটা ভেসে উঠতো—সেই ছবি এখন স্মৃতির দেয়ালে ঝুলে থাকা ফ্রেমে বাঁধানো এক তৈলচিত্র মাত্র। কালের ধুলো জমে যা ঝাপসা হয়ে গেছে।

প্রযুক্তির বিষবাষ্পে এখানকার প্রকৃতিও এখন মুমূর্ষু। ইট-পাথরে গড়া সুরম্য অট্টালিকা, গভীর নলকূপ, মাইলের পর মাইল পিচঢালা রাস্তা, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, ডিশ লাইন ছুটে চলেছে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া—কী নেই এখন গ্রামে? মাঝেমধ্যে মনে হয়, সন্ধেবেলা হারিকেনের নিভু নিভু আলোর সঙ্গে যত দিন আমাদের সম্পর্কটা দৃঢ় ছিল, তত দিনই বোধ হয় আমরা আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলাম। এরপর শহরের শক্ত প্রাচীর টপকে হুহু করে প্রযুক্তির জোয়ার যখন বইতে শুরু করল, আমরা সবাই তাতে ডুবে মরলাম।

আব্বা-আম্মা, বৃদ্ধা দাদিকে নিয়ে পরিবারে সাকুল্যে ছয়জন মানুষ আমরা। শিশির, মিনু এবং শৈশব—আমরা তিন ভাই-বোন। শাহিনুর নামে আমাদের সবার বড় এক বোন আছে। আদর করে আমরা ওকে শানু বলে ডাকি। শানুর বিয়ে হয়ে গেছে তাও আজ প্রায় ছয় বছর। বিয়ের পর মেয়েরা পর হয়ে যায়। স্বামীর বাড়িই তখন ওদের বাড়ি, তাই চাইলেও শানুকে এখন আর আমরা নিজেদের দলে টানতে পারি না। শানুর বর মানে আমার দুলাভাই পটুয়াখালির মানুষ। ওখানকার এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। মানুষ খুব ভালো। আদিল ও আয়েশা নামে ওদের দুই ছেলে-মেয়ে। স্বামী-সন্তান আর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে বলা চলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই যাচ্ছে শানুর দিনকাল।

অনার্সে উঠে মিনু আর অ্যাকাডেমিক ধাঁচের লেখাপড়া কন্টিনিউ করেনি। আব্বাই করতে দেননি। তার মতে মিনুর অ্যাকাডেমিক শিক্ষা এখন যথেষ্ট হয়েছে, মেয়েকে যেহেতু তিনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন না, তাই রোজ রোজ এত হাঙ্গামা করে কলেজ যেতে হবে না। তার চেয়ে বরং যা শিখলে দুনিয়া-আখেরাতে কাজে লাগবে সেসব শিখুক। তাই দুলাভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ওকে অনলাইনে একটা কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। শিখবে যখন বাড়িতে বসেই শিখুক। যদিও প্রথমে আমার এ ব্যাপারে সায় ছিল না, কিন্তু যখন শুনলাম শানু আপাকেও নাকি বিয়ের পর দুলাভাই এই কোর্সটা করিয়েছেন, অন্যদিকে মিনুরও এতে কোনো আপত্তি নেই, তখন মনে হলো জো হুয়া সহিহ হুয়া।

শৈশবকে নিয়ে আব্বার ভাবনাটা আবার একটু ভিন্ন। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পাশের দু'গ্রাম পরেই জেলা শহরের কাছাকাছি একটা বেশ ভালো মাদ্রাসা হয়েছে। ইতিমধ্যে নামডাকও ছড়িয়েছে বেশ। ক্লাস ফাইভের গণ্ডি পেরোলেই শৈশবকে দিয়ে দেয়া হবে সেই মাদ্রাসায়। ঘরে একজন আলেম মানুষ থাকা দরকার। শৈশবকে দেখে মনে হচ্ছে ও পারবে। পড়াশোনায় সে বরাবরই ভালো।

ছাত্র হিসেবে আমিও একেবারে খারাপ ছিলাম না। কিন্তু ওই এক করোনা আর পারিবারিক টানাপোড়েন আমার সবকিছু একেবারে লন্ডভন্ড করে দিল। অথচ কিছু মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য ভালো একটা চাকরি তখন কী যে ভীষণ দরকার ছিল আমার! পরিস্থিতির চাপে গলাকাটা মুরগির মতন শুধু ছটফট করেছি। নাওয়া-খাওয়াও সব প্রায় বন্ধ; ইংরেজিতে যাকে বলে ডিপ্রেশন। আব্বার চোখ অবশ্য এড়াতে পারিনি। আমার মনের সেই ভগ্নদশা দেখে তিনি বলেছিলেন, 'আরে এত ভেঙে পোড়ো না তো। লেগে থাকো বুঝলে? ইনশাআল্লাহ! যখন হবে, তখন এর চেয়ে ভালো কিছু হবে, দেখে নিয়ো।'

তবে শেষ পর্যন্ত যেটা হলো সেটা কতটা ভালো হলো তা জানি না। কিন্তু আমার একটা গতি হলো এই আরকি। আমাদের স্কুলের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষক সুবল দত্ত করোনার সময় মারা গেলেন। দীর্ঘ লকডাউন শেষ করে ছেলেমেয়েরা আবার শ্রেণিকক্ষে ফিরতে শুরু করেছে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং-এর কোনো শিক্ষক নেই। এদিকে শিক্ষক নিবন্ধনও বন্ধ। নতুন করে যে শিক্ষক নিয়োগ হবে, সে সুযোগও নেই। অগত্যা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ঠিক করল, অস্থায়ীভাবে একজনকে নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু কাকে করা হবে? মেধাবী ছেলেপেলে তো গ্রামে আর কেউ নেই। দফায় দফায় তাই এ নিয়ে বৈঠক হলো। অনেক আলোচনা সমালোচনার পর যে নামটা উঠে এলো সেটা শুনে রীতিমতো আমি স্তম্ভিত। সে ভদ্রলোক নাকি আমি। একজন সদ্য অনার্স পাশ করা আদু ভাই।

আমাকে নির্বাচনের পেছনে অবশ্য গোটা কতক কারণও ছিল। প্রথমত দাদাজান এই স্কুলে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি ম্যানেজিং কমিটিরও একজন সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বর্তমান ম্যানেজিং কমিটিতে যারা আছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের পারিবারিক আপনজন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, লেখাপড়ায় আমি নাকি খুব ভালো—এ-রকম একটা গুজব অনেক দিন ধরেই স্কুলপাড়ায় বেশ চর্চা হচ্ছিলো। নইলে কেউ ক্লাস টেনে উঠে নাইনের ছাত্রকে টিউশন করায়?

চাকরি অস্থায়ী হলেও মাঝেমধ্যে এটা ভেবেই অবাক লাগে যে, এককালে যে স্কুল থেকে নিজে পাঠ নিয়েছি, এখন সেই বিদ্যাপীঠেরই অ্যাকাউন্টিং-এর শিক্ষক আমি। পাশাপাশি অষ্টম-নবম ও দশম শ্রেণির সাধারণ গণিতটাও দেখতে হয় আমাকে। একেই বুঝি বলে History repeats itself. পাশাপাশি মাস্টার্সের লেখাপড়া। যদিও কলেজে খুব একটা যাওয়া হয় না। সে সুযোগই-বা কোথায়? চারটায় স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরে সন্ধ্যায় আবার দুটো টিউশন। টিউশন শেষে শ্রান্ত মনে কিছুক্ষণ মাখন কাকুর দোকানে চা খেতে খেতে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টুকটাক আড্ডাবাজি করি। সব শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত নয়টা কি দশটা। তারপর বাসায় ফিরে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুতেই ঘুম। ক্লান্ত মস্তিষ্কের একটুখানি অবসর।

মাঝে মাঝে এই একঘেয়েমি জীবনের প্রতি খুব ক্লান্তি ভর করে। ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে দূরে কোথাও একটা চলে যাই; কিন্তু পারি না। দায়িত্ব, দায়িত্ব আমাকে অদৃশ্য শেকলে বেঁধে ফেলেছে। তাইতো রাতের বেলায় বিছানায় পিঠ ঠেকালে ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসে যখন, তখনই আব্বার কাশির দমক, দাদিজানের বাতের ব্যথায় গোঙানি, ভাই-বোন দুটোর ছোট ছোট আবদার, মায়ের

সাংসারিক ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো একে একে চোখের পাতায় ভেসে ওঠে। ভয়ে ভয়ে বিছানায় উঠে বসি। বিবেক যেন ধিক্কার দিয়ে বলে, স্বার্থপর হোস নারে মন!

এরপর সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন আমি সেই আগের আমি। হিসাব কষে দেখি, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিনতম কাজ হচ্ছে নিজের জীবন বয়ে বেড়ানো। কত চড়াই-উতরাই! কত বন্ধুর পথ! তবুও দিনশেষে বাড়ি ফিরে যখন মায়ের মুখটা দেখি, ছোট ভাই-বোন দুটোকে পাশাপাশি বসে পড়তে দেখি, আব্বাকে দেখি এখনো কেমন করে মনের জোরে ভর দিয়ে বেঁচে আছেন, তখন কেন জানি খুব করে মনে হয়—এই জীবনটাকে বড্ড বেশিই ভালোবেসে ফেলেছি আমি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ বোধ হয় রাত একটু বেশিই হয়ে গেল। টিউশন শেষ করে নিত্যদিনের মতো বাজারে একটু আড্ডা দিতে বসেছিলাম। বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ আর নেই গ্রামে। ইমরান, অপু, রানা, জাকারিয়া—থাকার মধ্যে এই চারজন। বাকিরা সবাই খেলাঘর গুছিয়ে নিয়েছে। কেউ ছেড়েছে গ্রাম, তো কেউ একেবারে দুনিয়া। জীবন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আগের মতো সেই উদ্দামতা নেই। যৌবনের টলটলে দিঘির জলে অবেলায় বড় বড় ছায়া পড়েছে। পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে পারলেই যেন বেঁচে যাই। দিনশেষে তাই ওদের নিয়ে একটু বসি। চা খেতে খেতে মাঝেমধ্যে ডুব দিই ফেলে আসা অতীতের দিনগুলোতে। কখনো ভাবনায় চলে আসে অনাগত ভবিষ্যৎ। মনে পড়ে যায় মৃত্যুর কথা। এই তো গেল সপ্তাহেই দক্ষিণ পাড়ার হাসিব ছেলেটা মারা গেল। বয়সে আমার থেকে অন্তত দু বছরের ছোট হবে। কোথাও কোনো অসুবিধা ছিল না, দিব্যি সুস্থ হাসি-খুশি ছেলেটা। তার আগের দিন বিকেলেও একসঙ্গে চা খেয়েছি। গল্প করেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি হার্ট অ্যাটাক। এই বুঝি মানুষের জীবন! সেদিন হাসিবের জানাজায় দাঁড়িয়ে গালিবের সেই বিখ্যাত লাইন দুটোর কথা খুব মনে পড়ছিল—

‘পৃথিবীতে পোশাকবিহীন এসেছিলে হে গালিব!
একটা কাফনের জন্যে এত লম্বা সফর করলে?’

সত্যিই বড় লম্বা সফর হয়ে যাচ্ছে। চাওয়া-পাওয়ার ফিরিস্তি বেড়েই চলেছে ক্রমশ। নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাই কিন্তু পারি না। মনের অসুখ। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম রাস্তাটা বোধ হয় মনের রাস্তা; স্টিয়ারিং-এ যিনি বসে আছেন, তিনি জানেন না কোথায় কোন বাঁক নিতে হবে। শুধু নিয়তির হুইল ধরে বসে থাকা। ধরণীর বিশাল রঙ্গমঞ্চে মানুষ এক আজিব দর্শক। যে পথ সে চেনে না, যে দৃশ্য তার অজানা—সেই পথ সেই দৃশ্যই তার নিজের। সেই বাঁকেই তার আপন পথের বাঁকবদল। তাইতো চলছি হরদম। টিকিট কেটে একবার যখন রঙ্গমঞ্চে ঢুকেই পড়েছি, তখন দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ভিড়বে এ তরি!

বাজারে সন্ধের এই সময়টা খুব মেজাজি। গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষগুলো সারাদিন খেত-খামারে কাজবাজ শেষ করে এই সময়টাতে একটু হাওয়া বদলে দোকান-পসারে বের হয়। চায়ের কাপ সামনে রেখে শুরু হয় তাদের খোশগল্প। ধীরে ধীরে সে আলাপ ব্যক্তিগত থেকে উঠে আসে জাতীয় পর্যায়, সেখান থেকে আন্তর্জাতিক।

এর মধ্যে গত দেড়-দু বছর যাবৎ মাখন কাকু আবার একখানা রঙিন টিভি ফেঁদে বসেছেন দোকানে। সন্ধে হলেই একের পর এক চ্যানেল আসে-যায়। জোয়ানদের সাথে সাথে দোকানে বসে থাকা বৃদ্ধরাও হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। সেদিন এক চাচাকে বলতে শুনলাম, অ্যাই একটু সিআবি দে তো, সিআইবি। আমি একটু অবাকই হলাম। সিআইবি আবার এলো কোত্থেকে? রিমোট হাতে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা মাখন কাকুর ছোট্ট নাতিটা বলল, সিআইডির কথা বললা দাদু? বৃদ্ধ হাসিমুখে 'আরে হুঁ' বলে মাথা নাড়ালেন বার তিনেক। ফোকলা দাঁতে বেশ লাগছিল 'হুঁ' শব্দটা।

মৃত্যুরে সবাই চেনে—তাহারে এড়াতে চায়—কোথায় পালাবে তবু এই সৃষ্টি ঢের বড়ো; তবুও কোথায় মৃত্যু নাই?

আমাদের বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে হওয়ায় বাজার পেরোলেই কেমন একা হয়ে যাই। অবশ্য রাতবিরেতে এক হাঁটার অভ্যেস আমার আছে। কিন্তু আজ শীত প্রকৃতিতে যে ফুঁ দিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে রাতের শরীরে বার্ধক্য নেমেছে। কেমন থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছপালা, তরুলতা। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পা চালাচ্ছি; তবু মনে হচ্ছে অদৃশ্য থেকে পা-দুটোকে কে যেন টেনে ধরে রেখেছে। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছের পাতা খসে শিশির বিন্দুগুলো এমনভাবে রাস্তার পিচের ওপর গড়িয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন বর্ষাকাল। যেন একটু আগেই খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নিজের মাঝে জড়সড়ো হয়ে থাকা প্রকৃতি এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

কথায় বলে, 'উন বর্ষায় দুনো শীত'। শীতকালটা এবারে শুরু থেকে বেশ জাঁকিয়ে বসলেও বর্ষাকালটা কিন্তু ছিল নির্জীব-নিস্তেজ। রোদে পুড়ে চারিদিক কেমন খাক হয়ে যাচ্ছিল, অথচ বৃষ্টির কোনো দেখাই নেই। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি বোধ হয় পথই ভুলেছে। উৎকট গরমের সে কী যাতনা! অথচ এর পরপরই এমন ভারী বর্ষণ শুরু হলো যে, কার্তিক মাসেও নিস্তার নেই। মুরুব্বিরা বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার